শিশু-কিশোর গল্প

জাপানী দেবতা

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

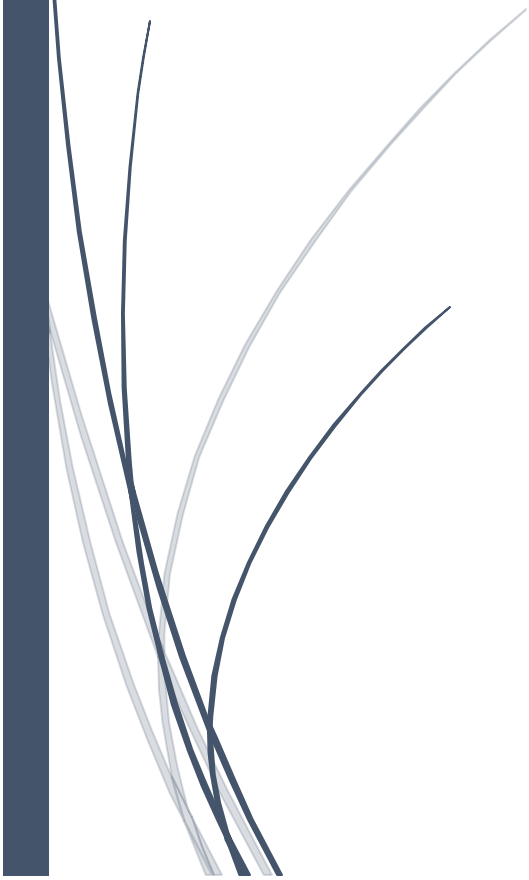

জাপান দেশে ‘কোজিকী’ বলে একখানা পুরানো পুঁথি আছে। তাতে লেখা আছে যে, পৃথিবীটা যখন হয়েছিল সেটা তেলের মত পাতলা ছিল, আর ফেনার মত সমুদ্রে বেসে বেড়াত।

তখন নাকি মোটে তিনটি দেবতা ছিলেন। এই তিনটি মরে গেলে আর দুটি হলেন; তাঁরা মরে গেলে আর দুটি হলেন; তাঁরা মরে গেল আর দুটি- তাঁরা মরে গেরে আবার দশটি দেবতা হলেন।

এই দশটি দেবতার একজন ছিলেন ‘ইজানাগী’; তাঁর স্ত্রী নাম ছিল ‘ইজানামী’

অন্য দেবতারা এঁদের দুজনের হাতে একটা শূল দিয়ে বললেন, ‘তোমরা এই তেলের মতন জিনিসটা থেকে পৃথিবী তয়ের করো।’

ইজানাগী আর ইজানামী বললেন, ‘আচ্ছা।’ বলে তাঁরা সেই শূল দিয়ে সমুদ্রটাকে ঘাঁটতে লাগলেন। তারপর যখন শূল তুললেন, তখন তার মুখ বেয়ে যে জল পড়েছিল, তাই থেকে একটা দ্বীপ হল, তার নাম ‘ওনগরো’। এই ওনগরো দ্বীপে একটি সুন্দর বাড়ি তয়ের করে, তার ভিতরে ইজানাগী আর ইজানামী বাস করতে লাগলেন। সেইখান থেকেই তাঁরা জাপান দেশটাকে গড়েছিলেন। এই দেশকে আমরা বলি ‘জাপান’ কিন্তু সে দেশের লোকেরা বলে ‘নেপ্পন’ বা ‘দাই-নিপ্পন’।

ইজানাগী আর ইজানামীর অনেক ছেলে মেয়ে। তার মধ্যে ‘আগুন-দেবতা’ একজন। এই দেবতার জন্মের সময় ইজানামী মরে গেলেন। তখন মনের দুঃখে ইজানাগী চোখের জল ফেলতে লাগলেন, আর সেই চোখের জল থেকে ‘কান্না-পরীর’ জন্ম হ’ল। কাঁদতে কাঁদতে শেয়ে ইজানাগীর রাগ হল। তখন তিনি তলোয়ার দিয়ে আগুন-দেবতার মাথা কেটে ফেললেন, তাতে সেই কাটা দেবতার শরীর আর রক্ত হতে ষোলটা দেবতা উঠে দাঁড়াল।

কিন্তু ইজানাগীর মনের দুঃখ তাতেও ঘুচল না। শেষে তিনি ইজানামীকে খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে পাতালে উপস্থিত হলেন-সেই যেখানে মৃত্যুর পরে সকলকেই যেতে হয়। পাতালের ভিতর মস্ত পুরী আছে, সেই পুরীর দরজার

গিয়ে ইজানামীর সঙ্গে তাঁর দেখা হল। ইজানামী তাঁকে বললেন, ‘একটু দাঁড়াও। আমি জিজ্ঞাসা করে আসি, তারপর তোমার সঙ্গে যাব।’ এই বলে ইজানামী ভিতরে গেলেন। ইজানাগী খানিক বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন, শেষে ইজানামীর দেরি দেখে তিনিও ভিতরে গেলেন। ভিতরে যেতেই এমনি ভয়ানক গন্ধ এসে তাঁর নাকে লাগল যে কি বলব। এমন ভয়ঙ্কর নোংরা জায়গায় কথা কেউ ভাবতেও পারে নাঃ আর সেখানে থেকে থেকে ইজানামীও এমন নোংরা হয়ে গিয়েছেন যে, তাঁর কাছে যাবার সাধ্য নাই। এ-সব দেখে ইজানাগী নাকে হাত দিয়ে সেখান থেকে ছুটে পালালেন। পেয়াদাগুলো তাঁকে পালাতে দেখে ‘ধর্ ধর্’ বলে তাড়া করেছিল, কিন্তু ধরতে পারে নি।

কি বিষম গন্ধই সে জায়গায় ছিল! দেশে ফিরেও ইজানাগীর গা থেকে সে গন্ধ গেল না। গন্ধে অস্থির হয়ে তিনি নদীতে স্নান করতে গেলেন। সেই সময়ে তাঁর কাপড় আর গা থেকে অনেকগুলি দেবতা বেরিয়েছিলেন।

এঁদের মধ্যে একটি মেয়ে ইজানাগীর বাম চোখ দিয়ে বেরিয়েছিলেন, সেটি এমন সুন্দর যে তেমন আর কেউ দেখে নি। সেই মেয়েটির নাম ‘গগন আলো’ তিনি সূর্যের দিবতা!

ইজানাগীর ডান চোখ দিয়ে আর-একটি দেবতা বেরিয়েছিলেন, সেটির নাম ‘তেজবীর’।

তখন ইজানাগী তাঁর নিজের গলার হার গগন-আলোর গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, ‘মা তুমি হলে স্বর্গের রানী।’

চন্দ্রপতিকে তিনি বললেন, ‘তুমি হরে রাত্রির রাজা।’ আর তেজবীরকে বললেন, ‘তুমি হবে সমুদ্রের রাজা।’ তখন গগন আলো গিয়ে স্বর্গের রানী হলেন, চন্দ্রপতি গিয়ে রাত্রির রাজা হলেন। কিন্তু তেজাবীর সেইখানে বসেই কাঁদতে লাগলেন। দিন নাই, রাত নাই, কেবলই গালে হাত দিয়ে কান্না। তাঁর দাড়ি লম্বা হয়ে ভুঁড়িতে গিয়ে ঠেকল, তবুও তাঁর কান্না থামল না।

ইজানাগী বলরেন, ‘আরে তোর হল কি? রাজ্য দিলাম, রাজ্যে গেলি না, খালি যে কাঁদ্‌ছিস?’

তেজবীর বললেন, ‘আমি রাজ্য চাই না। আমি সেই পাতালে আমার মার কাছে যাব।’

ইজানাগী বললেন, ‘তবে যা বেটা তুই এখান থেকে দূর হয়ে।’ বলে তিনি তাঁকে তাড়িয়ে দিলেন।’

যখন তেজবীর স্বর্গে গিয়ে গগন-আলোর কাছে উপস্থিত হলেন। গগন-আলো জানতেন, তাঁর মন ভাল নয়, কাজেই তিনি তাঁকে দেখে ভাবলেন, ‘না জানি কেন এসেছে!’

তেজবীর কিন্তু বললেন, ‘বাবা তাড়িয়ে দিয়েছেন, তাই মার কাছে চলেছি্ যাবার আগে তোমাকে দেখতে এলাম।’

গগন-আলো বললে, ‘তাই যদি হয়, তবে তোমার তলোয়ারখানা দাও ত।’

তেজবীরের কাছ থেকে তলোয়ার নিয়ে গগন-আলো সেটাকে চিবিয়ে গুঁড়ো করে ফেললেন। সেই গুঁড়ো থেকে তিনটি দেবতা জন্মাল।

তখন তেজবীর বললেন, ‘আচ্ছা, এখন তোমার গহনাগুলি দাও ত?’ গহনা নিয়ে তিনি চিবিয়ে গুঁড়ো করে ফেললেন, আর সেই গুঁড়ো তেকে পাঁচটি দেবতা হল।

এখন, এই যে সব দেবতা হল, এরা কারা? গগন-আলো বললেন, ‘তোমার তলোয়ার থেকে যারা হয়েছে, তারা তোমার, আর আমার গহনা থেকে যারা হয়েছে তারা আমার।’

কথাটা ত বেশ ভালোই হয়েছিল, কিন্তু হলে কি হয়, গগন-আলোর গহনা থেকেই যে বেশি দেবতা হয়েছিল। কাজেই সে সে কথা তেজবীরের পছন্দ হল না। তাতে বিষম চটে গিয়ে গগন-আলোর ক্ষেত মাড়িয়ে, খাল বুজিয়ে, বাগান ভেঙে, বিষম দৌরাত্ম্য আরম্ভ করলেন।

পর্বতের গুহার ভিতরে নিজের ঘরে বসে সখীদের নিয়ে গগন-আলো কাপড় বুনছিলেন, সেই ঘরের ছাত ভেঙে তেজবীর ভিতরে ছাল-ছাড়ানো মরা ঘোড়া ফেলে দিলেন।

কাজেই তখন আর গগন-আলো কি করেন, তিনি তেজবীরের ভয়ে গুহার দরজা বন্ধ করে দিলেন। এখন তিনিই হলেন সূর্যের দেবতা, আলোর মালিক। সেই আলোর মালিক হখন গুহায় লুকোতে গেলেন, তখন কাজেই জগৎ-সংসার অন্ধকার হয়ে গেল।

সকলে বলল, 'সর্বনাশ! এখন উপায়?' তখন তারা করল কি, তারা সবাই মিলে অনেক যুক্তি করে একখানা চমৎকার আরশি তয়ের করল, আর যার পর নাই সুন্দর একছড়া মণির মালা গড়াল, আরো কত কি জিনিস। তারা হেসে, গেয়ে, নেচে, লাফিয়ে চেঁচিয়ে, মোরগ ডাকিয়ে কি যে একটা শোরগোল জুড়ে দিলে, তা না শুনলে বোঝা যায় না।

শুহার ভিতর থেকে সেই গোলমাল শুনে গগন-আলো ভাবলেন, 'না জানি কি হয়েছে।' তিনি আস্তে আস্তে গুহার দরজা একটু ফাঁক করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আরে তোরা কিসের এত গোলমাল করছিস?'

তারা বলল, 'গোলমার করব না? দেখো এসে, তোমার চেয়ে কত সুন্দর একটি মেয়ে পেয়েছি।' বলেই সেই আরশিখানা এনে তাঁর সামনে ধরল।

সেই আরশির ভিতরে নিজের সুন্দর মুখখানি দেখে আর সূর্যের দেবতা লুকিয়ে থাকতে পারলেন না। তিনি তখনি ছুটে বেরিয়ে এলেন-আর অমনি সকালে গিয়ে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে হুড়কো এঁটে দিল।

তখন আবার সূর্য উঠল, আবার আলো হল, আবার সংসারে সুখ এল। তারপর সবাই মিলে সেই দুষ্ট তেজবীরকে দূর করে তাড়িয়ে দিল।

সেখান থেকে তাড়া খেয়ে, তেজবীর ঘুরতে হী নদীর ধারে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে দুটি বুড়োবুড়ি একটি ছোট্ট মেয়েতে নিয়ে বসে কাঁদছিল, তাদের দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কাঁদছ কেন? কি হয়েছে?'

বুড়োটি বলল, ‘বাবা, আমার দুঃখের কথা শুনে কি করবে? আমার আটটি মেয়ে ছিল, তার সাতটি অজগরে খেয়েছে, এই একটি আছে। সে বড় ভয়ঙ্কর অজগর, তার আটটি মাথা। বছরে একবার করে আসে, আর আমার একটি মেয়েকে খেয়ে যায়। আবার তার আসবার সময় হয়েছে, এবারে এটিকেও খাবে। তাই আমরা কাঁদছি।’

তেজবীর বললেন, ‘এই কথা? আচ্ছ তোমাদের কোনো চিন্তা নাই। আমি যা বলছি, তাই করো। আট জালা খুব কড়া রকমের সাকী (জাপানী মদ) তয়ের করো ত। করে, ঐ জায়গায় রেখে দাও, তারপর দেখো কি হয়।’

বুড়ো সেইদিনই আট জালা সাকী তয়ের করে তেজবীরের কথামত সাজিয়ে রেখে দিল। সাকীর গন্ধে চারিদিকে ভুর ভুর করতে লাগল। ঠিক সেই সময় অজগর গড়াতে গড়াতে আর ফোঁস ফোঁস করতে করতে এসে উপস্থিত হয়েছে, আর সকলের আগে সেই সাকীর গন্ধ গিয়েছে তার নাকে। আর কি সে বেটা তার লোভ সামলাতে পারে? সে অমনি আট জালায় আট মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে সাকী খেতে লাগল। খেতে খেতে তার চোখ বুঁজে এল, মাথা ঢুলে পড়ল; তবু হুশ নাই, সে চোঁ চোঁ করে খাচ্ছে। শেষে ঘুমে অচেতন হয়ে একেবারে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল। তা দেখে তেজবীর বললেন, আর কি? এই বেলা!’ বলেই তিনি তাঁর তলোয়ার নেয়ে এসে সেটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেললেন। তখন তেজবীর খুঁজে দেখলেন যে, সেই লেজের ভিতরে আশ্চর্য রকমের একখানা তলোয়ার রয়েছে। তিনি তখই সেই তলোয়ারখানা বার করে নিলেন।

তখন ত সকলেরই খুব সুখ হল। তারপর বুড়োর মেয়েকে বিয়ে করে, সেই দেশে সুন্দর বাড়ি তয়ের করে, দুজনে সুখে বাস করতে লাগলেন। আর সেই বাড়িতে যারপরনাই আদর যত্নে থেকে বুড়োবুড়িরও শেষকাল খুব আরামেই কাটল।

গগন-আলোর যে নাতি, তাঁর তিন ছেলে; দীপ্তানল, ক্ষিপ্তানল আর তৃপ্তানল।

দীপ্তানল মাছ ধরেন আর তৃপ্তানল শিকার করেন। একদিন তৃপ্তানল দীপ্তানলকে বললেন, ‘দাদা, চলো না, তোমার কাজটি আমি করিম আর আমার কাজটা তুমি করো-দেখি কেমন হয়।’ বলে, নিজের তীরধনুক দাদাকে দেয়ে, দাদার বঁড়শি আর ছিপ তিনি চেয়ে নিলেন। নিয়ে মাছ ত ধরলেন খুবই, লাভের মধ্যে বঁড়শিটা মাছে ছিড়ে নিয়ে গেল।

তারপর একদিন দীপ্তানর বললেন, ‘ভাই, শখ কি মিটেছে? এখন কেন আমার বঁড়শি আর আমাকে ফিরিয়ে দাও না।’ তাতে তৃপ্তানল ভারি লজ্জিত হয়ে বললেন, ‘দাদা বঁড়শি ত মাছে নিয়ে গেছে। এখন কি করে দিই?’ এ কথায় দীপ্তানর যার পর নাই রেগে বললেন, সে আমি জানি না। আমার বড়শি আমাকে এনে দাও।’

তখন তৃপ্তানল আর কি করেন, নিজের তলোয়রখানা ভেঙে টুকরো টুকরো করে তাই দিয়ে বঁড়শি বানিয়ে দাদাকে দিলেন। কিন্তু দাদার তাতে মন উঠল না। তিনি বললেন, ‘ও আমি চাই না, আমার বঁড়শি নিয়েছে, তাই এনে আমাকে দাও।’

তৃপ্তানল হাজার বঁড়শি এনে দীপ্তানলকে দিতে গেলেন, তাতেও হল না। দৃপ্তানল আরো রেগে গিয়ে বললেন, ‘আমার সেই বঁড়শিটি আমাকে এনে দিতে হবে।’ তা শুনে তৃপ্তানল মাথা হেঁট করে চোখের জল ফেলতে সেখান থেকে চলে গেলেন। ভাবলেন, ‘হায়! এখন আমি কি করি? সমুদ্রের মাছে বঁড়শি নিয়ে গেছে, তাকে আমি কোথায় খুঁজে পাব?’

এই কথা ভাবতে ভাবতে তিনি সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসে কাঁদছেন, এমন সময় সমুদ্রের দেবতা লবণেশ্বর সেইখানে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমার কি হয়েছে বাছা? তুমি কাঁদছ কেন? তৃপ্তানল বললেন, ‘দাদার বঁড়শি নিয়ে মাছ ধরতে এসেছিলাম, সেটা মাছে নিয়ে গেছে। তাতে দাদা বড্ড রাগ করেছেন। আমি আরো কত কাঁটা তাঁকে দিতে গেলাম, তিনি নিলেন না, বললেন, আমার তাই করো।’ বলে, তিনি তখনি একখানা নৌকা তয়ের করে তৃপ্তানলকে তাতে বসিয়ে দিলেন, আর দিয়ে গড়া একটা বাড়ি দেখতে পাবে, সেইকানে সমুদ্রর রাজা সিন্ধুপতি থাকেন। সেই বাড়ির পাশে

বাগানের ভিতরে কুয়োর ধারে একটা গাছ আছে, তার আগায় উঠে তুমি বসে থাকবে। সে বাগানে রাজার মেয়ে বেড়াতে আসেম সে তোমাকে তোমার বঁড়শির কথা বলে দেবে।'

এ কথায় তৃপ্তানল সেই নৌকা বেয়ে, সেই রাজার বাড়িতে গিয়ে সেই গাছে উঠে বসে রইলেন। খানিক বাদে রাজার মেয়ের দাসীরা কলসী হাতে করে সেই কুয়ো থেকে জল নিতে এল। এসে তারা দেখল যে, গাছের উপরে কেমন সুন্দর একটি রাজপুত্র বসে আছে। তৃপ্তানল তাদের বললেন, 'হ্যাঁ গা, তোমরা দয়া করে আমাকে একটু জল খেতে দেবে? দাসীরা অমনি সোনার গেলাসে দেবার সময়ে নিজের গলা থেকে মণি খুলে তার ভিতর ফেলে দিলেন। দাসীরা তা দেখতে পায় নি, তারা সেই মণিসুদ্ধ গেলাস নিয়ে রাজার মেয়ের ঘরে রেখে দিয়েছে।

তারপর রাজার মেযে জল খাবার জন্য গেলাস খুঁজতে এসে বললেন-'এ কি? গেলাসের ভিতর মণে কোথেকে এল রে?' তা ত আমরা জানি না, কুয়োর ধারে একটি রাজপুত্র খেতে দিলাম। মণি হয়ত তারই হবে।'

রাজার মেয়ে তখনি ছুটে গিয়ে তাঁর বাবাকে সব কথা বললেন। রাজা সিন্ধুপতিও এ কথা শুনেই তাড়াতাড়ি সেই কুয়োর ধারে চলে এলেন। এসে গাছের উপরি তৃপ্তানলকে দেখেই তিনি যার পর নাই আশ্চর্য আর খুশি হয়ে বললেন, 'আরে, তোমার নাম না তৃপ্তানল? আমাদের স্বর্গের রানী গগন-আলোর নাতির ছেলে! তুমি কেন কুয়োর ধারে বসে থাকবে বাবা? এসো এসো, ঘরে এসো!' বলে, তাঁকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে করতে রাজা তাঁকে সভায় নিয়ে এলেন। সভার লোক তাঁর নাম শুনেই ব্যস্ত হযে উঠে তাঁকে সেলাম করে জোড়হাতে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বাজা অনেক ধূমধাম করে তাঁর সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিলেন।

তারপর থেকে বেশ সুখেই দিন যায়। রাজা রোজই খবর নেন, তৃপ্তানল কেমন আছেন, রাজার মেয়ে বলেন, 'বেশ ভাল আছেন।' এমন করে তিন বৎসর চলে গেল। তারপর একদিন রাজা খবর নিতে এসে শুনলেন যে, তৃপ্তানল বিচানায় শুয়ে একটা খুব লম্বা নিশ্বাস ফেলেছিলেন।

অমনি রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, ‘বাবা, তুমি কেন নিশ্বাস ফেলেছিলে? তোমার কিসের দুঃখ?’ তৃপ্তানল বলরেন, ‘দাদার বঁড়শি নিয়ে মাছ ধরতে এসেছিলাম, সেই বঁড়শি মাছে নিয়ে গেছে। এতে দাদার বড্ড রাগ হয়েছে, আর বলেছেন যে, সেই বঁড়শি তাঁকে ফিরিয়ে না দিলে কিছুতেই হবে না।’ শুনে রাজা বললেন, ‘এই কথা? আচ্ছা-ডাক ত রে সকল মাছকে!’ রাজার হুকুমে পৃথিবীর যত মাছ কতরে এসে তাঁর কাছে হাজির হল, আর রাজা তাদের সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘বলো ত, তোমাদের কার গলায় সেই বঁড়শি আটকেছিল?’ তারা সকলে বললেন ‘তাই মাছের গলায় সেই বঁড়শি আটকেছিল। আজও তার খোঁচা লাগে।’ তখন রাজামশায় তাকে বললেন, ‘হাঁ কর, ব্যাটা, দেখি তোর গলাচ কি আছে!’ এ কথায় তাই যেই ‘অ-অ-অ-আ-ক!’ করে দুহাত চওড়া হাঁ-টি করেছে, অমনি দেখা গেল যে ঠিক সেই বঁড়শিটি তার গলায় বিঁধে রয়েছে। অমনি চিমটা দিয়ে সেটাকে বার করে আনা হল। তখন ত আর তৃপ্তানলের আনন্দের সীমা রইল না। রাজামশাই তাঁর হতে সেই বঁড়শীটি দিয়ে আরো দুটি মাণিক তাঁকে দিলেন! তার একটির নাম জোয়ার-মাণিক; তাকে ছুঁড়ে মারলে সেই সমূদ্র ছুটে এসে শত্রুকে ডুবিয়ে দেয়। আর একটির নাম ভাটা-মাণিক; তাকে ছুঁড়ে মারলে সেই সমুদ্র ফিরে চলে যায়।

তারপর কুমিরের রাজাকে ডেকে সিন্ধুপতি বললেন, ‘তুমি তৃপ্তানলকে তার দেশে পৌঁছিয়ে দিয়ে এসো। দেখো যেন তার কোনো ক্ষতি না হয়।’

সেই পাহাড়ের মত কুমির তৃপ্তানলকে পিঠে করে তাঁর দেশে পৌঁছিয়ে দিয়ে এল। তারপর দীপ্তানলকে তাঁর বঁড়শি ফিরিযে দিতে আর বেশিক্ষণ লাগল না। কিন্তু দীপ্তানল কোথায় তাঁর বঁড়শি পেয়ে খুশি হবেন, না তিনি আরো রেগে তলোয়ার নিয়ে তৃপ্তানলকে কাটতে গেলেন। তখন তৃপ্তানল আর কি করেন, তাড়াতাড়ি সেই জোয়ার-মানিককে ছুড়ে মারলেন। মারতেই ত সমুদ্রের জল পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে এসে দীপ্তানলকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল। তখন আর তিনি যাবেন কোথায়? ঢকঢক জল খেতে খেতে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, ‘রক্ষে করো ভাই! আমার ঘাট হয়েছে, আমি- আর অমন করব না!’ সে কথায় তৃপ্তানল ভাটা-মানিক ছুঁড়ে জল সরিয়ে তাঁকে

বাঁচালেন। তারপর থেকে দীপ্তানল ভাল মানুষ হয়ে গেলেন, আর ছোট ভাইকেই রাজ্য ছেড়ে দিলেন।

www.bengaliebook.com